রাজনীতিবীক্ষণ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

সূচি

ভূমিকা		৭
	দেশে	
১	সংখ্যাগুরুর গণতন্ত্র	৩৯
২	গণতান্ত্রিক আন্দোলন: সংকট ও সম্ভাবনা	৪৭
	রাজ্যে	
৩	মেধা, বঙ্গসমাজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ	৮৭
৪	পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল?	১০৯
৫	বিজেপি-র উত্থান এবার বাংলায়	১১৭
৬	ছলনা? প্রতারণা? না অন্য কিছু?	১৩২
৭	তবে কি জাতিগণনাই সমাধান?	১৩৬
৮	পুঁজিবাদ, শ্রেণী-জাতিবিন্যাস ও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ	১৪৩
	বিশ্বে	
৯	গণতন্ত্র ও জনবাদ	১৭৫
১০	আজকের দুনিয়ায় সমাজ-বিশ্লেষণ	২০৫
১১	বিশ্বের বৃহত্তম কারাবিদ্রোহ	২৩৫
১২	ট্রাম্প শাসনে ফ্যাসিবাদের ছায়া	২৪১

ভূমিকা

আমার প্রবন্ধ সংকলন *নাগরিক* প্রকাশিত হয়েছিল ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে। তার আগে ঘটে গেছে নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে দেশজোড়া আন্দোলন, ২০২০ সালের মার্চ মাসে ঘোষিত কোভিড মহামারী-জনিত নিষেধাজ্ঞার ফলে যার অবসান হয়। 'নাগরিকত্ব' নামে একটি ধারণা, উনিশ-বিশ শতক জুড়ে যার উদ্ভব, এবং নাগরিক আধিকার দাবি করা, সেই অধিকার রক্ষা করা, তা হারানোর আশঙ্কা—এই ছিল সেই বইটির আলোচ্য বিষয়। সেখানে প্রচ্ছন্ন ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারণা। তার নাম গণতন্ত্র।

বর্তমান সংকলনে সেই প্রচ্ছন্ন ধারণাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এসেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির আরও কয়েকটি ধারণা—জনবাদ, রাজনৈতিক সমাজ ও ফ্যাসিবাদ। এই সবকটি ধারণাই বিশদ তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দাবি করে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধ আর সাক্ষাৎকারগুলিতে সেই চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজবিজ্ঞান, বিশেষত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পুঁথিগত তত্ত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। যথাসাধ্য প্রাঞ্জলভাবে, নানা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে, তার ব্যখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথাগত পাঠ না থাকলেও এই রচনাগুলি পড়তে বিশেষ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ সর্বত্র নানা বিপদসংকেত দেখা দিয়েছে—পশ্চিমবঙ্গে, ভারতে, ইউরোপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নানা জায়গায় আজ ঘোষিত-অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলেছে। *নাগরিক* সংকলনের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখার জন্য তাই জরুরি অবস্থার আলোচনা দিয়েই আজকের গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ শুরু করা যেতে পারে।

গণতান্ত্রিক অধিকার ও জরুরি অবস্থা

নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার যে স্বতন্ত্র আন্দোলন আর সংগঠন আজ ভারতের নানা রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তার শুরু ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের জরুরি অবস্থা আর তার পরবর্তী ঘটনাক্রম থেকে। কিন্তু ভারতের কিছু কিছু রাজ্যে অনেক আগে থেকেই নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর ব্যাপক আঘাত হানা হয়েছিল। ১৯৫০-৬০-এর দশকে বর্তমান নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম ছিল অসম রাজ্যের অন্তর্গত পার্বত্য জেলা। সেখানে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। ভারত সরকার সেনাবাহিনী নামায়, অনেক ক্ষেত্রে (যেমন আইজল শহরের ওপর) বিমানবাহিনীর প্লেন থেকে বোমাবর্ষণ করে। অসমের ঐ অঞ্চলে ব্রিটিশ আমল থেকেই নানারকম বিশেষ আইনকানুনের ব্যবস্থা ছিল। ভারত সরকার সেইসব আইন পুরোদস্তুর ব্যবহার করে, তার ওপর নতুন সব বিশেষ আইন চালু করে, নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করেছিল। এমন একটি আইন হল আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট যা এখনও মণিপুরে বলবৎ রয়েছে। উত্তরপূর্ব ভারতের এইসব রাজ্যে সূর্যাস্তের পর কারফিউ একসময় সারা বছর ধরে চালু থাকত। জম্মু ও কাশ্মীরেও ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লা গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে প্রথাগত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে গেলে লোপ পেয়ে যায়। নির্বাচনের নামে প্রহসন আর দিল্লি থেকে মনোনীত একের পর এক পুতুল সরকারের মাধ্যমে সেখানকার প্রশাসন চলত। গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা লেখা থাকত কেবল সংবিধানের পাতায় আর সরকারি প্রচারে।

১৯৬৯ সাল থেকে তথাকথিত নকশালপন্থী আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে সেইসব রাজ্যে সশস্ত্র পুলিশি আক্রমণের পাশাপাশি ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। এইসময় আবিষ্কৃত হয় এনকাউন্টার ডেথ, ধৃত বন্দিকে আইন বাঁচিয়ে হত্যা করার অভিনব পন্থা। প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ আর অন্ধ্রপ্রদেশেই সবচেয়ে মারাত্মক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দিতে জেলগুলো ভরে যায়। তাদের এক বড় অংশকেই আটক করা হয়েছিল ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুলস অথবা মেইন্টেনেন্স অফ ইন্টার্নাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অর্থাৎ সেই কুখ্যাত মিসা

আইনে, যার ফলে তারা দীর্ঘদিন আটকে থাকে বিনা বিচারে। একের পর এক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। থানায় আর জেলে ধৃতদের জেরার নামে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, অবর্ণনীয় শারীরিক অত্যাচার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কোনও কোনও অঞ্চলে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর পুলিশ আর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সমবেত আক্রমণ প্রায় গণহত্যার চেহারা নেয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় এই সন্ত্রাস নকশালপন্থীদের ক্ষেত্রে সীমিত না থেকে ছড়িয়ে পড়ল সিপিআই(এম)-সহ অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর। প্রভূত বলপ্রয়োগ করে নির্বাচনে জিতে সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেস সরকার সবরকম বিরোধী বামপন্থী সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জোরে তছনছ করে দেওয়ার নীতি অবলম্বন করল।

পশ্চিমবঙ্গ বা অন্ধ্রের মানুষ যা আগেই দেখেছিল, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দেখা গেল ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর। জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন এবং ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ঘোষণার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাতে সংবিধানের অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ৩৫২ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদল ঘটানো হয়। এই ধারা অনুসারে নাগরিক স্বাধীনতার যেসব মৌলিক অধিকার সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় দেওয়া হয়েছে, যেমন বাকস্বাধীনতার অধিকার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকার, শ্রমিক ইউনিয়ন ইত্যাদি সংগঠনের অধিকার, কিংবা নিজের অধিকার রক্ষার জন্য আদালতে যাওয়ার অধিকার, সবই মুলতুবি হয়ে গেল। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে যে ফেডেরাল ব্যবস্থার কথা সংবিধানে বলা আছে, তা সরিয়ে রেখে রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মচারীকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জবাবদিহি করার নিয়ম চালু হল। সব পত্রপত্রিকার ওপর সেন্সরশিপ বসানো হল, যার ফলে সমস্ত লেখা সরকারি সেন্সর দপ্তর থেকে পাশ করিয়ে তবে ছাপতে দিতে হতো। এই ব্যবস্থার দরুন একটা অভিনব প্রতিবাদের কায়দাও সৃষ্টি হল। প্রায়সময় দেখা যেত, কোনও পত্রিকার পৃষ্ঠায় অনেকটা জায়গা ফাঁকা। পাঠক বুঝতে পারতেন, সেই লেখাটা সেন্সরের অনুমোদন পায়নি।